শান্তিনিকেতন

(সপ্তম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

সূচী

সত্যকে দেখা	...	...	১
সৃষ্টি	...	...	৬
মৃত্যু ও অমৃত	...	...	১০
তরী বোঝাই	...	...	১৭
স্বভাবকে লাভ	...	...	১৯
অহং	...	...	২৪
নদী ও কূল	...	...	৩৩
আত্মার প্রকাশ	...	...	৩৯
আদেশ	...	...	৪৭
সাধন	...	...	৫৩
ব্রহ্মবিহার	...	...	৬০
পূর্ণতা	...	...	৭৬
নীড়ের শিক্ষা	...	...	৮৩
ভূমা	...	...	৯১

শান্তিনিকেতন

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্চে, সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতি-মুহূর্ত্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্চে—আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্চে—তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করচেন, এই হচ্চে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা

সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়—সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মত আকার ধারণ করে; এই জন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্চে—চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্চে না—চারিদিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্চে—সেই জন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম্ম সৃষ্টিদ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়—সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্য্যন্ত অধিকার করে,—শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছয় না—

এই জন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে—তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য্য উঠ্‌চে ত উঠ্‌চে—নদী বইচে ত বইচে—গাছপালা বাড়চে ত বাড়চে—প্রতিদিনের কাজ নিয়মমত চল্‌চে ত চল্‌চে। সেই জন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখ্‌তে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখিনে—এমন কোনো ঘটনা জান্‌তে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন—তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখ্‌লে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের

মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়—জগৎ একটা যন্ত্রের মত আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না—প্রতিমুহূর্ত্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্চে বিকীর্ণ হচ্চে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এই জন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

সত্যকে দেখা

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করচেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তি-কেও নিয়ত প্রেরণ করচেন।

৩রা চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এই-খানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আস্‌চে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখ্‌লে এ একটি সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখ্‌লে এ বড় আশ্চর্য্য, প্রতিদিনই আশ্চর্য্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করচেন। আমরা মনে করচি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ

সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস্ চুকে গেল—কিন্তু এত ছোট ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়চি, পড়াচ্চি, খাচ্চি, বেড়াচ্চি, তখনো এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্ত্তা এরই সৃষ্টিকার্য্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্ম্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন—তিনি আমাদের এই কয়জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুল্‌চেন—তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই—বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড় কাজ এও যেন তাঁর তত বড়ই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলি হচ্চে, হচ্চে, হয়ে উঠ্‌চে। দিনরাত, দিনরাত! আমরা যখন ঘুমচ্চি তখনো হচ্চে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনো হচ্চে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্চে না, বা একমুহূর্ত্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করচেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখ্‌তে পাচ্চি—আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করচেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসচি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করচে—যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছয় না, মন পৌঁছয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বল্‌চে নমোনমঃ—আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি—যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন;—কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করচেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চল্‌চে তারও শক্তি বিকীর্ণ করচেন—আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ

ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন—আমাদের কয় জনের প্রকৃতি, সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলচেন—এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনো তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব—তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব—আমরা প্রত্যহ জেনে যাব—সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি—আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি—তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্চে—সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

৩রা চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মত অত্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল—আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন এবং ভোগের আয়োজন —যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্ব্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা কতপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল তা একটি মুহূর্ত্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারিনে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে

ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মত মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য্য কিছুই নেই। কোনো-প্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান ত মন থেকে খসে পড়ে-একেবারে শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম ছেড়ে দেওয়া ফেলে দেওয়া নিতান্তই একটা রিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মত—যা ছিল না তাকেই চম্‌কে উঠে' নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার ত মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কি। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে ত ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্য্যালোকে ত কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল

নির্ম্মলতায় মৃত্যুর চাকা ত ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি ; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা ? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখ্‌তে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ঐ আমার উপরেই সমস্ত জিনিষের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপরে ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধূলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে' যে কাঙালটা সব জিনিষকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিষকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে—কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন

সর্ব্বত্রই তাকে দেখ্তে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখ্বে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখ্তে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে—মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই

যদি চিরন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সে রকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জান্‌তে হবে যে এই সংসারটা থাক্‌বে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায় এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলি দিচ্চেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্চেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে;—

নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টান্‌বে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই ত সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়—তখনই শোক দুঃখ ভয়—তখনি কাম ক্রোধ লোভ; তখনি, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিষ স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্চি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকি-স্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ঠা চৈত্র

তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখে-ছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করচে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত—চারি-দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটু-খানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেই-জন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আস্‌চে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠ্‌চে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে

দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখ তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি ত রাখ্‌বার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্ম্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করচে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করচে, রক্ষা করচে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্চে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্চে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্চে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিষ নয়।

৪ঠা চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কি? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কি? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্চে বিসর্জ্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জ্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই—কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্ম্মই হচ্চে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জ্জন করা। আমরাও তা জানি—আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জ্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুসি নয় সে দিয়ে খুসি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মত জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না—যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনি আমাদের আনন্দের দিন,—তখনি সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ঐ যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিষই মুঠো করে ধরতে চায়—যে কৃপণ নেবার মৎলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মৎলব ছাড়া কিছু করে না—সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে

পরমাত্মীয়ের মত সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়—কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে—না জন্মায় না মরে। কিন্তু ঐ অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে—কিছু না পারে ত অন্তত তার ঐ নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, এ-কে একটা বাইরের লোকের মত আমি দেখ্‌ব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বল্‌ব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বল্‌বনা যে এ সমস্ত আমি পাচ্চি আমি নিচ্চি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি

বারবার করে বল্‌ব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরেনা বলে আবর্জ্জনায় ভরে উঠ্‌লুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরচি। এই মরণ-ধর্ম্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্চি।

অহং-এর স্বভাব হচ্চে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্চে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলি ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে —ভারি একটা সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে—আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে—সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মত

পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না— সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এ-তে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না—তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্ম্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ই চৈত্র

অহং

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিষকে আমার বল্‌তে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্চে।

আমাদের ত সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ ত কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়—এই বাধা কাটাতে

তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়; সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়—সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়—তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে' গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিষ বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কি করে? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কি?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে এক-বার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে

পারবে তাকেই তিনি আমার বল্‌তে দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাক্‌বে! সে দেবে কি? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বল্‌বার নেই!

ঈশ্বর ঐখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোট শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেল্‌তে খেলতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হার মেনে পড়ে যান—নইলে কুস্তির খেলাই হয় না—নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না—নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে—তেমনি ঈশ্বর আমাদের মত অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন—এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বল্‌তে দেন যে আমাদেরই জিত—বল্‌তে দেন যে আমার শক্তিতেই হল—বল্‌তে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন, আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকৃতে হয়। সেই জন্য তিনি কাঠবিড়ালীর পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধ্‌চ বটে—সাবাস্ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন—এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কি?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম্ম আছে সেই ধর্ম্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্ম্মটি হচ্চে সৃষ্টির ধর্ম্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম্ম। দেবার ধর্ম্মই হচ্চে আনন্দের ধর্ম্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্চে আনন্দময়স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়,

সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিষ সংগ্রহ করি—নইলে বিসর্জ্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল—যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমার জল—তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাওগে তাহলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় ত অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল ত দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই

হাসিতেই আমার ফুল-তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বল্‌বার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মে না।

তবেই দেখা যাচ্চে, অহং-এর ধর্ম্মই হচ্চে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম সব জিনিষেই নিজের নাম নিজের শিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকৃত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চল্‌ত না—সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকৃত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্ম্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে—আত্মার দেবার ধর্ম্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়—তবে কেবলমাত্র নেওয়ার

লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না—অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল ত বনের ফুল নয়, যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে! পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্চে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়—পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিষটা নেওয়া জিনিষটা কখনই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব, নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার

জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারি উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আন্‌ব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে ত নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বল্‌ছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বল্‌তে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না—ও সমস্তই বাইরে রাখ্‌তে হবে, বাইরে দিতে হবে—ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুল্‌বো না। অহং-এর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়—আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি

সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত—কেননা তিনি নিচ্চেন না তিনি দিচ্চেন—আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি—এই রচনাগুলি-দ্বারাই সে মুক্ত হবে—তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে—কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জ্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জন্য অহং তখনি আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ই চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্ম্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মত যে নিয়তই লেগে রয়েছে—শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনা সংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুল্‌চে এবং কেবলি এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্ত্তন ঘটাচ্চে—আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করচে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাক্‌বেএমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বল্লেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই

অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য—সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্ব্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করচে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠ্‌চে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জম্‌চে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলচে। এই চর কতবার ভাঙচে, কতবার গড়চে, কত স্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করচে—এর কোথাও বা গাছপালা উঠ্‌চে, কোথাও বা মরুভূমি—কোথাও জলাশয়ে পাখী চরচে

কোথাও বা বালির উপর কুমীরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্চে।

এই চিরপরিবর্ত্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়—ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য।—শেষকালে ফল্গুর মত নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মত। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র ; আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে—সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে দেশ দিয়ে যে কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে, তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিষটি কেবলি ভাংচে, গড়চে, কেবলি আকার পরিবর্ত্তন করচে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টি-কর্তাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়—আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড় হয়ে উঠে আত্মাকে বল্‌তে থাকে—তুমি চল্‌তে পাবে না, তুমি তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন দৌলতেই থাক, এই ঘরবাড়িতেই থাক, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাক।

যদি আত্মা আট্‌কা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকাল পাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে এই কূলের

দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ—এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করচে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করচে;—এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সঙ্গীত।

কিন্তু যখনি উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে—তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতিরোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা

অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে—নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে—তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ই চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে—সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্ম্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্ম্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকৃত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকৃত তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকৃত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্চে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে

অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলি যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই —যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করচে।

মনে কর একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে—ছোট মাপকাটি কি করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্বকে প্রকাশ করে? না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনো শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তা হলে বৃহত্বের সঙ্গে কেবল মাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার দ্বারাই বৃহত্বকে পদে

পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাটি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করচে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহতে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটচে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহতের প্রকাশ হচ্চে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভি-ব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চল্‌তে চল্‌তে সে ক্রমাগতই বল্‌চে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করচে। রূপের সীমাটি না থাক্‌লে তার গতিও থাক্‌তে পারত না—তার গতি না থাক্‌লে অসীম ত অব্যক্ত হয়েই থাক্‌তেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে ; অহং জন্ম-

মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে—আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে' তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জ্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে—রূপ কেবলি বলে, "এ-কে আমি বাঁধতে পারলুম না—এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চল্‌চে।" এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়—সে যেন তার রাজপথের

বিজয় তোরণের মত—তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাচ্চে—এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করচে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপ্‌চে আর কেবলি বল্‌চে—"না এ-কে আমি সীমা-বদ্ধ করে রাখতে পারলুম না।" সে যেমন সব জিনিষকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়—বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্ব্বনেশে জিনিষ আর কি হত!

তাই বল্‌ছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলি বাঁধচে এবং ছেড়ে দিচ্চে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করচে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকৃত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকৃত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে এইটেই হচ্চে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে' ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাবা ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে

না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহা বিদ্বান বলিনে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করচে, বাধাগ্রস্ত করচে না।

এই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি—আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি—আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়—মোহমুক্ত নির্ম্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে—সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাৎড়ে না বেড়ায়; সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের

সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে,মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ই চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবেনা তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সে রকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিমভাবে মান্‌তে পারিনে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানাননি—কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ—সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও! সূর্য্যকেও তাই বলেছেন—পৃথিবীকেও তাই বলেছন, মানুষকেও তাই বলেছেন।

সূর্য্য তাই জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্চে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষ্ড়ে যাচ্চে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্চে—সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

এই জন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ

স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বল্লেন তুমি লোভ কোরোনা, হিংসা কোরোনা, বিলাসে আসক্ত হোয়োনা। যে সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলির মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কি? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্ম্য নয়। সে হচ্চে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেননি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্ব্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা

আত্মার ধর্ম্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম্ম। তাঁর সেই ধর্ম্ম পরিপূর্ণ—কেননা তিনি শুদ্ধম্ অপাপ বিদ্ধং—তিনি নির্ব্বিকার তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্ব্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কি হব? পরমাত্মার মত সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্ম্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবেনা।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির

মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে—যে প্রার্থনা দেশ-
কালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে
নিয়ত উঠ্‌চে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে
পরমাণুতে যে প্রার্থনা—যে প্রার্থনার যুগ-
যুগান্তব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে
বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী
বলেছে—সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই
মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ কর,
আমাকে প্রকাশ কর। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন
আমাকে সত্যে প্রকাশ কর! আমি অন্ধকারে
আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ কর,
আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে
প্রকাশ কর। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ,
তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক্, আমার
মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক্—
সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের
জ্যোতিতে আমি চির কালের জন্যে রক্ষা পাব।
সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন— এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ ই চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করচি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্চিনে কেন? আমাদের মন বস্‌চে না কেন? আমাদের ভাব জম্‌চেনা কেন?

সে কি অম্‌নি হবে, আপনি হয়ে উঠ্‌বে? এতবড় লাভের খুব একটা বড় সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায় তা ঠিক মত জান্‌লে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বল্‌তে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তা হলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া ত অমন একটি ছোট ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে

একমনে নিযুক্ত করলুম কই ? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জান্‌তে চাও এই যে উপদেশ সে উপদেশের মত তপস্যা হল কই ?

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা ? জীবনের অল্প একটু উদ্বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা ? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর ? বল, যে, এই ত উপাসনা করচি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্চিনে কেন ? এত সস্তায় কোন্‌ জিনিষটা পেয়েছ ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাক্‌বার উপযুক্ত হবার জন্যে কি তপস্যাই না করতে হয়েছে ? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা ; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন।

সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠিনি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ-সাধনা চলেইচে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্ম বিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে?

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোট জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও

বড়—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিষই বড়।

এইটি মনে রাখ্‌তে হবে প্রতিদিন সকল কর্ম্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুল্‌তে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা ত একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসঙ্কোচ করতে শিখেছে;—তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে;—সভাস্থলে স্থির হয়ে বস্‌তে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখ্‌লে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না।

সমাজের সঙ্গে মিলে থাক্‌বার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভাললাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে—যে সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছ, এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুল্‌তে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করচি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি সে প্রশ্ন এখন থাক্।

প্রথমে শরীরটাকে ত বিশুদ্ধ করে তুল্‌তে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে

একেবারে সংস্কারের মত হয়ে আস্‌বে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্ব্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্ব্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুল্‌তে হবে—এ তনু ভগবানের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবেনা, অতি সহজেই সর্ব্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে—অর্থাৎ ভগবানের যে ইচ্ছা সর্ব্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ দ্বেষ লোভক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে—সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে

অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছচ্ছি না কেন সে যেমন অসঙ্গত বলা,—তেমনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্চিনে কেন এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ ই চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্ত্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না—সেই জন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিৎ খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তি-পথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়—শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে—শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে—যা

তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবেনা এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বল্‌বেনা এই একটি শীল, ন চ মজ্জপো সিয়া — মদ খাবে না এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—"ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্‌সরতি।" শীল সকলকে কি বলে অনুস্মরণ করেন ?

"অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্‌সানি, বিঞ্ঞুপ্‌পসত্থানি, অপরামঠ্‌ঠানি, সমাধি সংবত্তনিকানি।" অর্থাৎ আমার এই শীল খণ্ডিত হয়নি, এ'তে ছিদ্র হয়নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয়নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখ্‌চি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করেনি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই

শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয়নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্ত্তণ করবে।" এই বলে আর্য্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্চে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে—সেটি অনুবাদ করে দিই :—

বহূ দেবা মনুস্‌সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকাঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্চে যে, বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন সেই মঙ্গলটি কি বল!

বুদ্ধ উত্তর দিচ্চেন :—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানাঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা

করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্চে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো চ, পূব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্ম্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্ব্বকৃত পুণ্যকে বর্দ্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্ম্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু উপঠ্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো,
অনাকুলা চ কম্মাণি এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম্মকরা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মাণি, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

দান, ধর্ম্মচর্য্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞ্মো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মগুপানে বিতৃষ্ণা, ধর্ম্মকর্ম্মে অপ্রমাদ এই উত্তমমঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুঠ্ঠী চ কতঞ্ঞ্ঞতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গল মুত্তমং

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্ম্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথা-কালে ধর্ম্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপোচ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়া সচ্চান দস্সনং
নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুঠ্‌ঠস্‌স লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং ॥

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোক-ধর্ম্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্ব্বত্র অপ-রাজিত, তারা সর্ব্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্ম্মনীতিই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্ব্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্ব্বাণটি কি? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছন যেত না। তবে কেবলি সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বল্‌তে বল্‌তে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্ব্বশূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাপন লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল ত মঙ্গল দেখ্‌চিনে —মঙ্গলের চেয়েও বড় জিনিষটি দেখচি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে—অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভাল উদ্দেশ্য সাধন করে—কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্চে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলি দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ

নেই সেইটেই হচ্চে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি, নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ ত বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়—এ ত বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়—এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তি ভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বেসত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ

করুক ! সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক্ !

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাক্‌লে এই মৈত্রী ভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীল গ্রহণ শীল সাধন প্রয়োজন—কিন্তু শীল সাধনার পরিণাম হচ্চে সর্ব্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার—এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এত শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বল্‌চেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মথ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ,
সুবচো চস্‌স মৃদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থ কুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই :—তিনি শক্তিমান, সরল,

অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ,
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্পগবভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্ট হৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক অপ্রেগলভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক নিরাপদ হোক্ সুস্থ হোক্।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা,
দিঠ্‌ঠা বা যে চ অদিঠ্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কি সবল কি দুর্ব্বল, কি দীর্ঘ কি প্রকাণ্ড, কি মধ্যম, কি হ্রস্ব, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল, কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট যারা দূরে বাস করচে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অনবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হোক্‌!

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতি মঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্ঞা
নাঞ্ঞ মঞ্ঞস্স দুক্খ মিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়েবাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরোনা।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন নিজের একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

উর্দ্ধে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিঠ্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিঠ্‌ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলচ বসে আছ বা শুয়ে আছ। যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রী-ভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালবাসেন সেইরকম ভালবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্ব্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্ব্বত্র—তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে ত ব্রহ্মবিহার হলনা।

কথাটা খুব বড়। কিন্তু বড় কথাই যে হচ্চে। বড় কথাকে ছোট কথা করে ত লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়কে চাওয়া; উপনিষৎ বলেচেন ভূমাত্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়কেই জান্‌তে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কি সে ত স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোট করে ঝাপ্‌সা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেননি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই ত হল লক্ষ্য। কিন্তু এ ত আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চল্‌তে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে

তুলনা করে প্রত্যহ বুঝ্তে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্চে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্চে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্চে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়চে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব্ব করেননি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চল্‌তে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীল সাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন।

প্রতিদিন এই কথা স্মরণ কর যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট কর যে ক্রমশঃ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্ব্বভূতে প্রসারিত হচ্চে—অর্থাৎ একদিকে বাধা কাট্‌চে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্চে। এই পদ্ধতিকে ত কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না—এই ত নিখিললাভের পদ্ধতি, এই ত আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ ই চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন— তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যে রকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ কথাটিও ছোট কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে—এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড় কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মত

ভালবাস। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেননি। বলেননি যে প্রতিবেশীকে ভালবাস ; বলেছেন—প্রতিবেশীকে আপনারই মত ভালবাস। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে হবে— এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন—শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যাননি—শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্য্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্য্যন্ত দান কর।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড় লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্য্যন্ত দিয়ে ফেল্‌তে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক

প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোট বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জগতের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়কেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারীলোকের দুর্ব্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোট করে দেখাতে চাননি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড় কথাকেই অসঙ্কোচে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন।

এই বড় কথাকে এত বড় করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্য্যন্তই যায়—তার প্রেম এত বড়ই প্রেম—তার ত্যাগ এত বড়ই ত্যাগ।

অতএব এই বড় লক্ষ্য এবং বড় পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি

আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা ছেঁটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্ব্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সঙ্কীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাইনে, যা পারবার তা পারিনে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন। বুদ্ধ আমাদের কারো প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেননি, যখন তিনি বলেছেন "মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।" যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও!

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি

শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলিনে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর।

একবার ভিতরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ—প্রতি দিন কোন্‌খানে ঠেক্‌চে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিল্‌তে যাচ্চি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্চে! তার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হচ্চে না। অহঙ্কারে ঠেক্‌চে, স্বার্থে ঠেক্‌চে, ক্রোধে ঠেক্‌চে, লোভে ঠেক্‌চে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করচি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্চি। কোনমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আন্‌তে পারচিনে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা

যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিল্‌তে দেবেনা তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন কর্ব্বে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন—যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেননি—হাতে রেখে কথা কন্‌নি। তাঁরা বল্‌ছেন একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠ্‌তে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহঙ্কারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে

অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ ই চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই এ কথা বল্লে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তা হলে খোরাক কি? মানুষ বাঁচ্‌বে কি নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কি করে? মায়ের মুখ থেকে শুন্‌তে শুন্‌তে খেল্‌তে খেল্‌তে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধ-আধ—ব্যাকরণ ভুলে পরিপূর্ণ—তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সঙ্কীর্ণ—কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা

দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাক হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না; ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না; তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করচে— ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে—সেটাকে সর্ব্বত্র পাকা করে নিতে হবে—কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চ্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে

প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্ম্মে,—সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে তাহলে, হয় পাওয়াটা কাঁচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মত দুর্ব্বল মানুষকে বলেছিলেন এরা ভারি ভুল করে, কাকে কি বোঝে, কাকে কি বলে তার কিছুই ঠিক নেই, তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্ব্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিষটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপন মাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ঐ চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা ত নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে! ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভুল করি যাই করি,

কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মান্‌তে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখ্‌ব এ চলবে না, মার কাছেও শিক্ষা পাব।

মার কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে—সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই—একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি যে পর্যান্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্য্যন্ত খেতেই পাবেনা তা হলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চ্চা করব তেমন প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেল্‌তে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ কৃপার

দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে—এ ছাড়া উপায় দেখিনে।

এখন ত অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি—এখন ত নীড়েই পড়ে আছি। ছোটখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রয়—এই আশ্রয়ের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কি দশা হবে ?

তুমি বল্‌তে পার ঐ খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাক্‌বে—নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলিনে—ওড়বার প্রয়াসে দুর্ব্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুল্‌তে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যখনি পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? দ্বিজ শাবকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া। তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসার নীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটা নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেই টুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখ্‌লেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীন সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটা অত্যুক্তি প্রয়োগ করচেন—যা বল্‌চেন তার ঠিক মানে কখনই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ঐ যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু

নিরাধার উর্দ্ধে উঠ্‌তে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করচেন— ওটা কবিত্ব মাত্র, ওর মানে কখনই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসার নীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারিনে।

কিন্তু এসব আশ্চর্য্যকথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক— সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্চে সেই বার্ত্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি—তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর

প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বল্‌ব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো— আমি কেবল আনন্দ চাইনে শিক্ষা চাই—ভাব চাইনে কর্ম্ম চাই।

১৩ই চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব—তখন তিনি বল্লেন তোমার ও সব কথায় কাজ কি? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড় দুঃখে পড়েছ—তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখ্‌তে পার না, যা রাখো তাতে তোমার আশা মেটে না এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই—সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।—এই বলে দুঃখনিবৃত্তি-কেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই ত মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না।

সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্প পর্ব্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক—কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কি? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্দ্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি—আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্চে বড় হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম

নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়— বড় হবার ইচ্ছা। বড় হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড় করে উপলব্ধি করা। এই অভি-প্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্চে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই—লাভক্ষতির নির-ন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কিজন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড় হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্চি। তাকে এ কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ

কর—আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে!

বুদ্ধদেব যে দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন – সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড় আকর্ষণ কি? সে এই, যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড় করে জানে। খুব বড় রকম করে ত্যাগ, খুব বড় রকম করে ব্রত পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড় করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেক্‌তে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির

উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে চাইনে আমি দুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড় কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মানুষ বড়-কেই চায়।

সেই জন্যে উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়ই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়কেই জানতে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথা-টির তাৎপর্য্য যদি ঠিকমত বুঝি তাহলে কখনই বলিনে, যে, চাইনে তোমার বড়কে।

কেন না, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো না কোন বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়কেই চাচ্চি। অথচ যাকে বড় বলে চাচ্চি সে এমন বড় নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের

বড় তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিঃবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কি আর না করলেই কি—এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর কর, শুচি হও, সবল হও—আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু না কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে—শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়—অনুষ্ঠানটাই দেবতা হয়ে ওঠে—পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে—ব্যাকরণ